Vol. 28 | No. 1 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শরৎচন্দ্র : চিন্তা ও চেতনা

Volume	28
Issue	1
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাহমুদা খাতুন
Published online	September 1, 1984
DOI	10.62328/sp.v28i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i1.3
Pages	77-94
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শরৎচন্দ্র : চিন্তা ও চেতনা

মাহমুদা খাতুন

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। সুগভীর করুণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর প্রধান সাহিত্যসম্পদ। রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণবিকাশ কালে তাঁর আবির্ভাব হলেও কথাসাহিত্য রচনায় তাঁর স্বতন্ত্র পথটি সকলের চোখে পড়েছিল, এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাথে এক নিঃশ্বাসেই উচ্চারিত হতেন। শরৎচন্দ্রের ভিন্নতর মূল্যবোধ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, সচেতন সমাজদৃষ্টি ও বাস্তববোধ, সর্বোপরি বিদ্রোহের একটি ভঙ্গীর জন্য সমকালীন পাঠক-সমাজের অভিনন্দন তিনি লাভ করেছিলেন। সেইজন্য শরৎচন্দ্র তাঁর বক্তব্যে কতটা আন্তরিক, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর যথার্থ দৃষ্টি কি, মহৎ উপন্যাস রচনার শিল্পগত প্রেরণা ও সামর্থ্য তাঁর কতটা ছিল—এ-সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। সামাজিক নীতির দিক থেকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশাসন, রবীন্দ্রনাথের দ্বিধাকে যথার্থই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন কিনা সে-বিচারও পরবর্তী কালের অপেক্ষায় থাকে।

শরৎচন্দ্র অসাধারণ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তাঁর পাঠক 'তেতালা থেকে বটতলা', সর্বত্র। এই বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠী আকর্ষণ করার মত উপকরণ শরৎ-উপন্যাসে প্রচুর—সমাজ সচেতনতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, হৃদয়বোধ ও করুণা, রোমান্টিক ভাবাতিশয্য—এগুলো সাধারণ পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'গোরা', 'পথের পাঁচালী', 'কবি,' 'পদ্মানদীর মাঝি'র মত মহৎ উপন্যাস তাঁর একটিও নেই। পৃথকভাবে মহৎ উপন্যাসের উপকরণ শরৎ-সাহিত্যে যে নেই এমন কথা বলা যায়না, কিন্তু সকল উপকরণ কোন একটি উপন্যাসে সংহত হয়ে অখণ্ড শিল্প-প্রেরণায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। না 'শ্রীকান্ত', না 'গৃহদাহ', না 'চরিত্রহীন'—কোনটিই মহৎ শিল্প-পরিণতি বহন করে না।

মহৎ উপন্যাসের সংজ্ঞা এক কথায় দেওয়া কঠিন। তবে সাধারণভাবে মহৎ উপন্যাসে জীবন সম্পর্কে সমগ্রতাবোধ, সমস্যার নিরাসক্ত বিশ্লেষণ, লেখকের নিজস্ব জীবনদৃষ্টি—এই তিনটি লক্ষণ প্রধান। আবার এই তিনটি উপকরণের মধ্যে লেখকের জীবনদৃষ্টিই সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করে। "The deepest quality of a work of art will always be the quality of the mind of the producer."[১] শিল্পী-মনের গভীর মনীষার পরিচয়ই বিধৃত হয় মহৎ উপন্যাসে। 'অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ও মননসমৃদ্ধ'[২] কল্পনা যদি মহৎ উপন্যাসের ভিত্তি হয়, তবে বলা যায় প্রতিভার এই গভীরতা ও ব্যাপ্তি তাঁর ছিলনা। তিনি অভিজ্ঞতা, তথ্য ও কল্পনাকে গূঢ় মর্মের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের বিস্তৃত জীবনধারণার রূপ-রেখায় অঙ্কিত করতে পারেননি। তিনি মধ্যবর্তী স্তর-উদ্ভূত সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর জন্ম, শিক্ষা, পারিবারিক প্রতিবেশ, কর্ম সবই মধ্যবিত্তসুলভ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দিক-নির্দেশ করছে। তিনি মধ্যবিত্তদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক, এবং মধ্যবিত্ত মানসিকতা তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে যে বুদ্ধি বা মননশীলতা নয়, হৃদয়-চর্চাই তাঁর সাহিত্যের প্রধান দিক। এক ভক্তের এই উক্তি "রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়ে বোঝা যায়না, আপনার উপন্যাস সহজেই বুঝতে পারি"র জবাবে শরৎচন্দ্র নাকি বলেন—"তা ঠিক। তিনি লেখেন আমাদের জন্য, আমি লিখি তোমাদের জন্য।" শরৎচন্দ্রের উক্তি তাৎপর্যময়। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসের সাথে সাধারণ পাঠকের অপরিচয়ই ছিল, অথচ শরৎচন্দ্র পড়েনি এমন লোক দুর্লভ। তত্ত্বগত বিশ্লেষণ অপেক্ষা সহজ পাচ্য নিটোল গল্পের জন্যই শরৎচন্দ্র সাধারণ পাঠকের অভিনন্দন-ধন্য হয়েছিলেন। শিল্প-বিচারে তিনি রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কখনোই নন।

জনপ্রিয়তা যদি সাফল্যের মাপকাঠি হয়, তবে শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। কিন্তু তাঁর শিল্প-কর্ম দুর্বল—এই দুর্বলতার উৎস কি? প্রতিভার পরিমিতি সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র সমাজ-সচেতন, অভিজ্ঞতা-নির্ভর শিল্পী, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও করুণা-পূর্ণ হৃদয়বোধও ছিল তাঁর—এগুলোও উপন্যাসের মহৎ গুণ, কিন্তু একটি অখণ্ড বোধ ও বিশ্বাসকে তিনি কখনো তাঁর শিল্প-কর্মে প্রকাশ করতে পারেননি। মূল্যবোধের অসঙ্গতি ও দ্বিধাই শরৎ-সাহিত্যের সব চেয়ে বড় ব্যর্থতা। জীবন-দৃষ্টির দ্বিধা-বিভক্তিই তাঁর সকল

দুর্বলতার উৎস। তিনি তাঁর উপন্যাসের নায়িকা অচলার মতই প্রথানুগত্য ও প্রগতি-চিন্তার মধ্যে দোলায়িত হয়েছেন, এবং পরিণামে অচলার মতই শোচনীয়তা ডেকে এনেছেন। আদর্শের সত্য ও বাস্তবের সত্য দুই মিলেই সাহিত্যের সত্য গঠিত হয়। তবে এই দুই উপকরণের সঠিক পরিমাপ সর্বকালে সব ব্যক্তিতে এক হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কি এই সত্য-বোধে এক? তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিভূতিভূষণের মধ্যেও পার্থক্য কতদূর বিস্তৃত। তাঁদের শিল্পী-মানস কখনো বিচলিত বা দ্বিধা-গ্রস্ত নয়, যদিও তাঁরা উপলব্ধ সত্যকে কখনো কখনো অতিক্রম করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনের নৈরাজ্যের পরে পরবর্তী কালে সমাজ-তন্ত্রকে অবলম্বন করে আশাবাদী চেতনায় সংহত হননি? বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী'তে একদিকে অতিরূঢ় বাস্তব অন্যদিকে স্বাপ্নিকতাকে একই সূত্রে গ্রথিত করেননি? কিন্তু শরৎচন্দ্রের মধ্যে বোধ ও মননের এই গতিশীলতাকে ধরা যায়না। শরৎচন্দ্রের দুর্বলতা দুটি--প্রথমতঃ, দ্বিধা-মুক্ত জীবনবোধ তাঁর ছিলনা ; দ্বিতীয়তঃ, উপন্যাসের সমস্যাকে সমগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত করে শিল্পগত পূর্ণতা দিতে পারেননি। তাঁর বিচার-দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ আসক্তি-মুক্ত ছিলনা, এজন্য অবশ্যম্ভাবীরূপে আংশিকতায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। ভাবাতিশয্য তাঁর রচনার আর একটি বড় ত্রুটি। বুদ্ধি নয়, হৃদয়ই তাঁকে পরিচালিত করেছে। তিনি স্বভাব কবির মত স্বভাব লেখক ছিলেন। তিনি প্রায় স্বশিক্ষিত, বিভিন্ন প্রবন্ধে মননশীল চিন্তা ও চেতনার ছাপ তিনি রাখতে চেয়েছেন, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। 'শেষ প্রশ্ন' ও 'পথের দাবী' তার প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একটা মিল পাওয়া যায়। দীর্ঘ কুড়ি-বাইশ বৎসর কবি-জীবনে নজরুলের কোন পরিণতি আসেনি, 'বিদ্রোহী'কে তিনি অতিক্রম করতে পারলেননা কখনো, আগাগোড়া 'প্রতিভাবান বালকই' রয়ে গেলেন। নজরুলের মতই শরৎচন্দ্র পরিণতিহীন, 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'নিষ্কৃতি', 'পল্লীসমাজ' বা 'বামুনের মেয়ে'র চেয়ে মহত্তর কিছু সৃষ্টি করতে পারলেন না।

শরৎ-মানসের দ্বৈত চেতনা, মূল্যবোধের দ্বিধা ও অসঙ্গতির কারণ অনু-সন্ধান করতে পারি তাঁর জীবনের মধ্যে। তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত ছক থেকে কতগুলি তথ্য চোখে পড়ে। তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাল কেটেছে

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী শহর ভাগলপুরে, জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে নয়। যৌবনের কিছুকাল ভবঘুরে বৃত্তি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন নানা জায়গায়। ভাগ্যান্বেষণে গেছেন ব্রহ্মদেশে, রেঙ্গুন শহরেই কেটেছে একটানা ১২ / ১৩ বৎসর। সেখান থেকে লেখকের পরিচয় নিয়ে ফিরে বাকী জীবন কেটেছে কলকাতা বা কলকাতার উপকণ্ঠে। তিনি কখনোই 'পল্লীসমাজের' অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামী, রক্ষণশীলতা বা ঐতিহ্যবাহিতার ভিত্তিভূমিটি কোথায় ? বাল্যকাল থেকে তিনি ছিন্নমূল, দারিদ্র্য ও অন্যান্য কারণে পরানুগ্রহে প্রতিপালিত, যৌবনের নিরুদ্দেশ ও নিরাসক্ত ভ্রমণ, ব্রহ্মদেশে একটানা ১২ / ১৩ বৎসরের জীবন, ফিরে যখন এসেছেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ। প্রথার প্রতি আনুগত্য, ট্র্যাডিশনের প্রতি বিপুল মোহ তাঁর এ বিচিত্র জীবনধারায় গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল কি ? অথচ তাই ঘটেছে। এর প্রথম কারণ মনে হয় বাল্যেই ফেলে আসা গ্রাম ও সমাজের স্মৃতি যা পরবর্তী নাগরিক-জীবনেও মমতার সাথে স্মরণ করেছেন সর্বদা। হুমায়ুন কবির এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "A child of a middle class family of Bhagalpur, Chattarjee had his attachment to the social pattern of his group. Emigrant societies are generally exclusive and touchy about their customs and beliefs. People at the frontier often cling more and more tenaciously to conventions. The British colonist dressing for dinner in his solitary cabin in a wild forest is only an extreme example of this tendency."[৩] এটাই সম্ভব। প্রবাসী মানুষটি দূরবর্তী দেশের মূল চেতনাপ্রবাহ অজ্ঞাতেই হয়ত আপনার প্রাণে ধারণ করেছিলেন। হুমায়ুন কবির এর কিছু পরই অবশ্য বলছেন শরৎচন্দ্র তাঁর সামাজিক চেতনা, সহানুভূতি ও কল্পনাবৃত্তির দ্বারা এই ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র অনুদার ও প্রথাবদ্ধ যে ছিলেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাক— "দিদি আমি কোন কালে খাওয়া ছোঁওয়ার বাছ বিচার করিনে, কিন্তু মেয়েদের হাতে কোন দিন কিছু খাইনে। শুধু খাই তাদের হাতে যাদের বাপ মা দু'জনেই ব্রাহ্মণ, এবং বিয়েও হয়েছে ব্রাহ্মণের সাথে।"[৪] কোন মানুষেরই সাম্প্রদায়িক অনুদারতা থাকা উচিত নয়, আর শরৎচন্দ্রতো

হলেন সংবেদনশীল লেখক। তবু তাঁর মধ্যে এই সংকীর্ণ চিত্ততা এসেছে কেন? কুলীন বংশে শরৎচন্দ্রের জন্ম, কুলীন ব্রাহ্মণের বহু অন্ধ-সংস্কার তাঁরও ছিল। উপবীতের মহিমায় বিশ্বাস, ছোঁওয়া-ছুঁয়ি মেনে চলা, পূজা-অর্চনা, স্বপাক আহার, জাতিভেদে আস্থা, অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহে কুণ্ঠা—এ-সবই শরৎ-উপন্যাসে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সাথে উপস্থিত হয়েছে। আবার পূর্ণ যৌবন থেকে চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অতিবাহিত করেছেন ব্রহ্মদেশে। ব্রহ্মদেশ সনাতন আচার প্রথাচ্যুত অসংখ্য হিন্দুর আশ্রয় ও মিলন-স্থল ছিল। শরৎচন্দ্র এইসব অপরাধী ও পলাতকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, দরদের সাথে তাদের দুঃখ-বেদনার পরিচয় নিয়েছেন, কিন্তু মূল প্রশ্নে কখনো আপোষ করেননি। জীবনাচরণ ও পরিবেশ যদি বিশ্বাস গড়ে তোলে তবে সৎ ও আন্তরিকভাবেই শরৎচন্দ্রের উদার ও প্রগতিশীল হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি তা হননি। বাল্য ও কৈশোরেই যে পল্লীসমাজের সাথে তিনি সম্পর্কচ্যুত, তার প্রতি শরৎচন্দ্রের মমতার শেষ ছিলনা। এই সূত্র ধরেই শরৎ-মানসে দ্বিধা ও অসঙ্গতির প্রবেশ।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আর একটি ভ্রান্ত ধারণা এই যে তিনি বাস্তববাদী লেখক। অবশ্যই শরৎচন্দ্র অভিজ্ঞতা-নির্ভর শিল্পী, কিন্তু এটুকুর উপর নির্ভর করেই তাঁকে বস্তুবাদী বলা যায় না। তাঁর উপন্যাসে বাস্তব চিত্র ও চরিত্র অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু শিল্পী হিসাবে তিনি রোমান্টিক। তাঁর উপন্যাসে বুদ্ধির বদলে হৃদয়াবেগ, যুক্তির বদলে অলস কল্পনাই অধিক। বস্তুতন্ত্রের নিরাসক্ত সত্যদর্শন ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কখনোই পাওয়া যায় না। শতকরা নিরানব্বই জন অর্থাৎ সাধারণ গড়পরতা মানুষ বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের অবলম্বন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারা কখনোই এ্যাভারেজ শ্রেণীতে পড়ে না। সাধারণ সমাজ-স্তর থেকে এলেও তারা মহত্ত্বে অসাধারণ, অথচ কেন অসাধারণ হলো তার কোন ব্যাখ্যা নেই। পরিবেশকে মানুষ, অন্ততঃ এ্যাভারেজ মানুষ অতিক্রম করতে পারেনা—আদর্শবাদী রোমান্টিক প্রেরণায় শরৎচন্দ্র এই সত্য বিস্মৃত হয়েছেন, বা বাস্তবকে অগ্রাহ্য করেছেন। বাস্তব সংসারে সতীশ সাবিত্রী কিরণময়ী রাজলক্ষ্মী রমেশ ক'জন আছে? এরা কি এ্যাভারেজ বাঙ্গালী পুরুষ-রমণী? তিনি সর্বাংশে রোমান্টিক বলেই পরিবেশ অতিরিক্ত সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছেন এদের মধ্যে। চরিত্রহীন উপন্যাসের মেসের ঝি সাবিত্রীকে ধরা যাক। সাবিত্রী

সর্বগুণান্বিতা, তার সম্পর্কে একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র বলছেন—"অনেকেই এটা ভুলে যান যে সাবিত্রী সত্যই ঝি-ক্লাশের মেয়ে নয়। পুরাণে আছে একবার লক্ষ্মী দেবীও দায়ে পড়ে দাসীবৃত্তি করেছিলেন।"[৫] এই কি বস্তুতান্ত্রিক চরিত্র সৃষ্টি ? না শরৎচন্দ্র বস্তুতান্ত্রিক লেখক ? এই আদর্শায়িত রোমান্টিকতা শরৎ-উপন্যাসের সর্বত্র। অথচ, তাঁর যৌবনে শরৎচন্দ্র নাকি সাত শত পতিতার জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন! বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিরও আভিজাত্যের একটা দূরত্ব আছে—এই আভিজাত্য মহত্ত্বের। এগুলোর কাছাকাছি হওয়া যায় না। তাছাড়া শরৎচন্দ্র ভাবালুতা বা sentimentality-তে অতিশয় আক্রান্ত, ভাব-প্রবণতার জন্য তিনি জীবনের নিরাসক্ত বিশ্লেষক হতে পারেন নি। আকস্মিকতা ও আতিশয্য তাঁর উপন্যাসে অতি প্রবল—যা বাস্তবপরিপন্থী। তত্ত্বের চেয়ে, বুদ্ধি ও যুক্তির চেয়ে হৃদয়-বোধ ও কল্পনা তাঁকে রোমান্টিক ভাবপ্রবণ সাহিত্যিক করেছে, সে-জন্যই ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর তিনি প্রিয় ঔপন্যাসিক। ডিকেন্স যেমন সাধারণ ইংরেজের লেখক, শরৎচন্দ্রও তেমনি সাধারণ বাঙ্গালীর প্রিয় সাহিত্যিক। শরৎ-উপন্যাসে জীবনে যা দুর্লভ সেই মহত্ত্বের স্বীকৃতি ঘটাতে বাঙ্গালী পাঠক বড়ই আত্মতৃপ্ত। শরৎচন্দ্রের বাঙ্গালিত্বই তাঁর জনপ্রিয়তার মূল কারণ।

শরৎ-মানসে সমাজসত্তার প্রকৃত স্বরূপটি বুঝতে হলে একটু পেছনে তাকাতে হবে। ১৮৫৬ সালের বিধবা বিবাহ আইন ও ১৮৭২ সালের Civil Marriage Act III (তিন আইনের বিয়ে) পাশ নারী-অধিকার ও মর্যাদার একটি বৃহৎ পদক্ষেপ। কিন্তু সমকালে তা উপেক্ষিত ও নিন্দিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রজ্জ্বলিত বাস্তববোধ ও সমাজ-সচেতনতা নয়, নব্য হিন্দুত্বের কালে বঙ্কিম-সৃষ্ট জাতীয়তা, ন্যায় ও মূল্যবোধই প্রধান হয়ে উঠেছিল দেখা যায়। এই ধারাটা ঊনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীতেও সাহিত্যচেতনায় প্রবহমান ছিল। বঙ্কিমের সমাজ ও নীতি-বোধের সাথে যথার্থ বিচ্ছেদ দেখা গেল প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী নবীন সাহিত্যিকদের রচনায়—এর পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমের সাথে পরবর্তীদের মূল্য-বোধগত পার্থক্যটা শ্রেণীগত নয়, মাত্রাগত।

"For one thing, he lacks an artistic detachment and surrenders his judgment to the socio religious prejudices of

the day. In Aristotelian terms, he imitated not nature, but the contemporary conception of life. This explains his immediate and immense popularity."[৬] শরৎ-মানস ও সাহিত্য মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি যথার্থ বলে মেনে নিতে বাধা নেই। কিন্তু আসলে হুমায়ুন কবির তাঁর শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত বইটিতে এ-মন্তব্য করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে। শরৎচন্দ্র প্রথানুগত্য ও নীতির প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত কড়া সমালোচক ছিলেন। এটা একটা আয়রনি যে, তিনি নিজেই বঙ্কিমের নীতিবোধকে অতিক্রম করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক আদর্শ রক্ষার জন্যই ১৮৭৩ সালে 'বিষবৃক্ষ' রচনা করলেন, এবং বিধবা বিবাহের বিষময় পরিণাম বাঙ্গালীর সামনে তুলে ধরলেন, ১৮৭৮-এর 'কৃষ্ণকান্তের উইলের'ও সেই একই বক্তব্য। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকতা সত্ত্বেও বঙ্কিমের সমাজচেতনা ও মানব হৃদয়ে গূঢ় অন্তর্দৃষ্টি আশ্চর্য রকম সন্ধানী ও সংহত। দুটি উপন্যাসেই শুধু বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করা নয়, গভীরতর সমস্যাকে আলোতে নিয়ে এসেছেন তিনি। বঙ্কিম অনুভব করেছিলেন স্বামীর মত স্ত্রীও একনিষ্ঠতা-প্রত্যাশী। নগেন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহ না করে কুমারী বিবাহ করলে সূর্যমুখীর অন্তর্যাতনা কম হতো কি? ভ্রমরের সমস্যা স্বামীর বিধবাগমন নয়, চরিত্রহীনতা। ভ্রমর স্বামীর ভালবাসা চায়, সেই সঙ্গে চায় স্বামীর পূর্ণ মনুষ্যত্ব। তাই যতদিন গোবিন্দলাল শ্রদ্ধার পাত্র ততদিনই ভ্রমর তাকে শ্রদ্ধা করে। নারী হত্যাকারী গোবিন্দলালের প্রতি সে ক্ষমাহীন। সমাজের শিক্ষকের ভূমিকা বঙ্কিমের অবশ্যই ছিল, কিন্তু ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্ব ও পরিবার-সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে একটা সামগ্রিক চেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, যার ব্যাপ্তি ও গভীরতা শরৎচন্দ্রে অকল্পনীয়।

পরবর্তী কালে কুন্দ ও রোহিনী হত্যার জন্য বঙ্কিম নিন্দিত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র বললেন সমাজনীতিকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি সাহিত্যনীতিকেই হত্যা করেছেন। শরৎচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন সাহিত্যনীতি বলে আলাদা কিছু নেই, সমাজনীতিরই প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। বঙ্কিমের উপর সুবিচার করে বলা আবশ্যক দুটি মৃত্যুই বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাস দুটির শেষ কথা নয়। তবু মেনে নেওয়া গেল কুন্দ ও রোহিনীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটানো বঙ্কিমের অকর্তব্যই হয়েছে। কিন্তু বিধবা বিবাহের সমস্যা পরবর্তী

কালে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কি ভাবে মীমাংসা করলেন ? রবীন্দ্রনাথ বিধবার প্রেমাধিকার নিয়ে 'চোখের বালি' রচনা করলেন। বিধবা বিনোদিনী ও বিহারীর মধ্যে ভালবাসা হলো, কিন্তু প্রত্যক্ষ কোন সামাজিক বাধা (কলকাতা শহরে পল্লীসমাজ নেই, বিহারী অবিবাহিত, আর্থিক স্বাধীনতা আছে তার) না থাকা সত্ত্বেও বিবাহ হলোনা তাদের। কারণ বিনোদিনী ভাবে বিহারী বিধবা বিবাহ করলে তার সম্ভ্রম হানি ঘটবে। প্রেমাস্পদের কল্যাণের জন্যই স্বেচ্ছায় সে কাশী চলে গেল। তারপর শরৎচন্দ্র কি করলেন? তিনি বিধবা রমাকে কাশী পাঠালেন, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের সেবার অধিকার পেয়েই কৃতার্থ থাকলো, আর সাবিত্রী তার অপবিত্র দেহ দিতে চাইলনা সতীশকে। সবাইকে শরৎচন্দ্র উপবাসী রাখলেন সমাজ ও সম্ভ্রমের কারণেই। অবাক হতে হয় এ-কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র কেউই বিধবার বিবাহকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিলেন না। ভারতীয় সনাতন সতীত্ববোধ হিন্দুর মানসে (রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম তো উন্নত হিন্দুধর্মই) এত দৃঢ়মূল ছিল যে, শত যুক্তি সত্ত্বেও স্বামীর মৃত্যুর পরে হিন্দুনারীর পুনরায় পতিগ্রহণ কিছুতেই সমর্থন পেলোনা। শরৎচন্দ্র নিজে সতীত্বের এই রক্ষণশীল ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ-সম্পর্কে তাঁর খোলা উক্তি—"আমি ভেবে দেখেছি আমার মনের কোনে সত্যিই এক গোঁড় কন্‌জারভেটিভ লুকিয়ে আছে। আমাদের সংস্কার বা আচার-বিচারের ওপর আমি খড়গহস্ত, বিরুদ্ধে যখন যুক্তি দেই, মনে প্রাণে বিশ্বাস করেই দেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখেছি, যখনই আমার মনের কোনে সেই কন্‌জারভেটিভটি মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে, তখনই আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। যেমন ধরনা বিধবা বিবাহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিধবাদের পুনর্বিবাহে অনুমতি না দেওয়া স্ত্রী জাতির প্রতি পুরুষ জাতির অন্যায়ের জঘন্য দৃষ্টান্ত। সংসারের অনেক পাপ-তাপের এও একটা কারণ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, বিধবা বিবাহ দেবার অনুমতির দায়িত্ব যখন আমার উপর আসে, তখন অন্তর থেকে সে অনুমতি আমি কিছুতেই দিতে পারিনে।"[৭] এর পরে আর বলার কি থাকে ?

শরৎচন্দ্রের সমাজবোধের পরিপূর্ণ পরিচয় নেবার জন্য তাঁর রচনাবলীকে দুটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম স্তরের উপন্যাসগুলি পল্লীগ্রাম-ভিত্তিক। 'শুভদা', 'কাশীনাথ', 'দেবদাস', 'বিরাজ বৌ', 'নিষ্কৃতি', 'রামের সুমতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'মেজদিদি', 'পল্লীসমাজ', 'বড় দিদি',

'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে', 'পণ্ডিত মশাই' প্রভৃতি রচনা প্রথম স্তরের। দ্বিতীয় স্তরে 'পরিণীতা', 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'নববিধান', 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন', 'শেষের পরিচয়' ও 'বিপ্রদাস'। প্রথম স্তরের রচনাগুলিতে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার বিশেষ প্রকাশ নাই। তবে বহির্জগতের সম্পর্কচ্যুত, প্রথাবদ্ধ অনগ্রসর গ্রামীণ জীবনযাত্রার এগুলি প্রায় নিখুঁত ছবি। এর মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার শোষণ ও সামাজিক শাসনে পিষ্ট অসহায় মানুষের কাতরতা ও বেদনার চিত্র আছে। কিন্তু এটাও সত্য যে ঔপন্যাসিক প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের চেষ্টা করেননি। বরঞ্চ প্রচলিত সামাজিক-কাঠামোর আওতায় লালিত মূল্যবোধেরই জয়গান করা হয়েছে। গতানুগতিক ও মানবাত্মার পক্ষে অবমাননাকর সামাজিক পদ্ধতিকে বদলাবার আকূতি নেই, বরঞ্চ আত্মসমর্পণের ঝোঁকই বেশী লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে—হিন্দুনারীর সনাতন পাতিব্রত্য শরৎচন্দ্রের খুব শ্রদ্ধা ও গর্বের বিষয় ছিল। 'শুভদা' উপন্যাসের শুভদা, 'চন্দ্রনাথের' সরযূ, 'বিরাজবৌ'-এর বিরাজ, 'শ্রীকান্ত' ১ম পর্বের অন্নদা দিদি, 'পণ্ডিত মশাই'র কুসুম এরা সকলেই আদর্শ স্ত্রী ও সতী নারী। স্বামীর অবিচার অত্যাচার মেনে নিয়ে এরা সকলেই পত্নীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়েও বড় এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম"[৮]—শরৎচন্দ্রের এই প্রবল মানবিক উক্তি এই শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে প্রমাণিত হয়নি।

আবার 'পল্লীসমাজের' রমা, 'বড়দিদি'র মাধবী—প্রভৃতি চরিত্র অবলম্বন করে সামাজিক অনুশাসনের নিষ্ঠুরতা দেখানো হলেও প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করবার কথা শরৎচন্দ্র ভাবেন নি। রমাকে শেষ পর্যন্ত গ্রাম পরিত্যাগ করে কাশী চলে যেতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের উক্তি—"কিন্তু হিন্দু সমাজে এ সমাধানের (রমা ও রমেশের মিলন) স্থান ছিল না। তার পরিণাম হলো এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নর-নারী এ-জীবনে বিফল-ব্যর্থ-পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকু যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত আর বেশী কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়।"[৯] মাত্র 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের কাঠামোয় এ-কথা সত্য। তিনি এ-উপন্যাসে সমাজের অচলায়তন ভাংতে চাননি, কারণ রমেশকে দিয়ে প্রধানতঃ তিনি গ্রামের উন্নতি করাতে চান।

রমার ভালবাসা তাই রমেশের আকাঙ্ক্ষার বস্তু, কিন্তু এর জন্য সমাজের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কথা সে স্বপ্নেও ভাবে না। তার গ্রামোন্নতিকে নিরাপদ রাখবার জন্যই রমাকে কাশী যেতে হয়। পাঠকের সহানুভূতি লাভ ছাড়া রমা-রমেশের সম্পর্ক নিয়ে শরৎচন্দ্রের অন্য কোন প্রগতিশীল উদ্দেশ্য ছিলনা। কিন্তু পরবর্তী কালের উপন্যাসে যেখানে বিধবা বিবাহকে বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ ছিল, সেখানেও তিনি এসেছেন পিছিয়ে। মধ্যবিত্ত মানসিকতাই শরৎচন্দ্রকে ট্র্যাডিশনাল বা ঐতিহ্যবাদী করে রেখেছে। কিন্তু এই সব গ্রামনির্ভর রচনায়ই শরৎচন্দ্র সব চেয়ে শিল্প সফল। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মানবিকতা এই গ্রামীণ কথা-কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সর্বোত্তমভাবে, এটিই তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র। শহরের উঁচুস্তরের জীবন-ধারার সাথে অপরিচয়ের কারণে পরবর্তী কালের নগর-কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি কৃত্রিমতা ও ফলহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। গ্রামের আট-পৌরে জীবন, পরিচিত সমস্যাবলী, যা চিত্রিত হয়েছে 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'নিষ্কৃতি' বা 'বৈকুণ্ঠের উইলে', কত সহজেই না তা হৃদয়কে স্পর্শ করে। শরৎ-সাহিত্যের প্রকৃত শক্তি ও সৌন্দর্য এই অনাড়ম্বর পল্লীজীবন-ভিত্তিক রচনাগুলিতেই— একথা মানতেই হবে।

প্রথম স্তরের উপন্যাসগুলির বক্তব্য ও চরিত্র মোটামুটি সরল। কিন্তু বয়স, সুনাম ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে চিন্তাশীল উপন্যাস রচনা করতে চাইলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র পণ্ডিত লোক ছিলেন না, তাই গ্রাম-বাংলার নিজস্ব ক্ষেত্রটি পরিত্যাগ করার ফল শরৎ-সাহিত্যে শুভ হয়নি। প্রথমতঃ যে অভিজ্ঞতা-নির্ভরতা তাঁর প্রধান শিল্প-বৈশিষ্ট্য ছিল, নগরকেন্দ্রিক মননশীল উপন্যাসে তা কার্যকরী হতে পারেনি। নাগরিক-জীবনে উচ্চতলার যারা অধিবাসী তাদের জীবনধারা ও চিন্তা-চেতনার সাথে শরৎচন্দ্রের পরিচয় অস্পষ্ট থাকাতে তাঁর এই শ্রেণীর চরিত্রের জীবন-আচরণে ও চিন্তায় ফাঁক থেকে গেছে। দ্বিতীয়তঃ যে-সকল নৈতিক অথবা সামাজিক সমস্যা এই স্তরের উপন্যাসে তিনি এনেছেন তার মননশীল ও যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিলনা, কারণ আগাগোড়াই তিনি স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত। এই জন্য এই স্তরের উপন্যাসগুলি ত্রুটিহীন শিল্প-পরিণাম বহন করেনা, লেখকের দুর্বলতা, দ্বিধা ও প্রথার কাছে আত্মসমর্পণ অত্যন্ত প্রকট। প্রথম স্তরের রচনায় যে

জীবনাবেগ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে (প্রথাগত পথে হলেও) প্রকাশ পেয়েছে, দ্বিতীয় স্তরে আরোপিত চিন্তাশীলতার জন্য তা খণ্ডিত। কতগুলি উদাহরণ দেওয়া যাক। শরৎচন্দ্র মুক্ত বুদ্ধির প্রশংসা করছেন এই স্তরের উপন্যাসে—অথচ অন্ধ বিশ্বাসকে কি সম্মানই না দিয়েছেন 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের সুরবালা চরিত্রটিতে। স্বয়ং কিরণময়ী তার সরল অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে পড়েছে। তিনি জাতিভেদ প্রথাকে মানেন না, অথচ 'পথের দাবী'তে অপূর্বর সমস্ত ধর্ম-আচরণকেই খ্রীষ্টান ভারতী শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বিপ্রদাসের মায়ের খাম-খেয়ালী ছোঁয়া-ছুঁয়ি বিচারকে শরৎচন্দ্র অহেতুক কি শ্রদ্ধাই না প্রদর্শন করেছেন। তাঁর উপন্যাসে দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী চরিত্র উপেন্দ্র ও বিপ্রদাস। তাদের দাম্পত্য-জীবনের পূর্ণ চিত্র শরৎচন্দ্র দেননি, অকারণে সুরবালা ও সতীর মৃত্যু ঘটিয়ে দুটি চরিত্রকে আরো সুদূর করা হয়েছে। ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণ এখানে খণ্ডিত। মোটকথা চিন্তাশীল উপন্যাসের যে বিস্তৃতি ও গভীরতা প্রয়োজন—শরৎচন্দ্রের তা ক্ষমতার অতীত ছিল। আমরা শুধু তাঁর মানসিকতার দ্বৈধতার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় স্তরে পূর্বের প্রথাবদ্ধতা ও রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে সামাজিক পরিবর্তন ও বিদ্রোহের চেতনাকে বুঝি মুক্তি দিতে চেয়েছেন। প্রথম পর্বের শুভদা, অন্নদা দিদি, বিরাজ, সৌদামিনীর সনাতন পাতিব্রত্যের পরে অভয়া, অচলা, কিরণময়ী, রাজ-লক্ষ্মী, সাবিত্রীর স্বাধীন প্রত্যয়দীপ্ত প্রতিবাদ বস্তুতঃ বিস্ময় উদ্রেক করে। শরৎচন্দ্র আন্তরিক ভাবেই দ্বিতীয় স্তরে প্রথাবদ্ধতার স্থলে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শরৎ-মানসের হিন্দু রমনীর পতিব্রতা-স্বরূপ, ও এক-পতিত্বের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ও মোহ শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ট্র্যাডিশন ও প্রগতি-চিন্তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত ট্র্যাডিশনেরই জয় হয়েছে। স্বামী পরি-ত্যাক্তা অভয়া প্রেমিক রোহিণীকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছে সুদূর রেঙ্গুনে, ব্রহ্মদেশ সেই সময়ে পলাতক ও অপরাধী হিন্দুদের আশ্রয়স্থল ছিল। প্রত্যক্ষ হিন্দু-সমাজের শাসনের বাইরে রেঙ্গুন শহরে স্বামীত্যাগ করে অন্য পুরুষ গ্রহণ তেমন কোন ব্যাপারই নয়। বাংলাদেশে এ-রকম ঘটনা ঘটলে তাঁর গুরুত্ব অন্যরকম হতো। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিধবার বিবাহই দেন না, স্বামী বর্তমানে সধবা রমণীর বিবাহ! তাঁই শরৎচন্দ্রের হয়ে শ্রীকান্ত বারবার

নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে 'আমার অন্নদা দিদি এমন কখনোই করতোনা।' অন্নদা দিদিই শরৎচন্দ্রের মতে আদর্শ হিন্দু নারী, স্বামীর সকল দুষ্কৃতি ক্ষমা করে মৃত্যু পর্যন্ত স্বামীর সহগামিনী তিনি। এমন সতীত্ব, এমন পতি-প্রেম হিন্দু-সমাজ চিনতে না পেরে কলঙ্কিনী অপবাদ দিল! শরৎচন্দ্রের সেটা ক্ষোভ, বিদ্রোহ নয়। অচলার মধ্যে নারী হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের দ্বন্দ্ব পাওয়া যায়। প্রেমজ বিবাহের পরেও নারী হৃদয় অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হতে পারে—এই আধুনিক সমস্যা অচলার মধ্যে উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা উপস্থাপন পর্যন্তই শরৎচন্দ্রের আধুনিকতা, শেষ রক্ষা করতে পারেন নি তিনি। কাহিনীতে মৃণাল চরিত্রটি এনে তিনি বোঝাতে চাইলেন হিন্দু নারীর সতীত্ব শিক্ষা হয়নি বলেই (ব্রাহ্মদের প্রতি শরৎচন্দ্রের ঘৃণা কারো অজানা নেই) অচলার এই দুর্দশা। দেহ-মনে একনিষ্ঠতাই যদি সতীত্ব হয়—তা বিবাহ বা ধর্মনিরপেক্ষও যে হতে পারে একথা শরৎচন্দ্র বুঝতে চাননি। মহিমের প্রতি অচলার ভালবাসাটাই যে জোরালো নয়—এ সত্যের দুয়ার থেকে শরৎচন্দ্র ফিরে এসে মৃণালকে নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা দিলেন। দেহগত শুচিতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অসম্ভব গোঁড়ামী ছিল, মুখে তিনি যাই বলুন। তাই অচলার দেহ অপবিত্র হওয়ার দিন থেকে এক অসীম পাপবোধে তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন তিনি—অথচ এই দেহমিলন অচলার দিক থেকে সম্পূর্ণ হৃদয়সম্মতিহীন। শরৎচন্দ্রের এই রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যই অচলা দুর্বল দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রে পর্যবসিত হয়েছে, নৈতিক অপরাধের কালিমা তাকে ম্লান করে রেখেছে সর্বদা; নারী হৃদয়ের দ্বন্দ্ব ও ও দহনের মধ্য দিয়ে মহত্ত্ব অর্জন করতে দেয়নি।

কিরণময়ী শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বিদ্রোহ-পরায়ণ চরিত্র। সে শাস্ত্র মানে না, ঈশ্বর মানে না, হিন্দুর সমাজ-সংসার-পরিবারের কোন মূল্যবোধেই তার বিশ্বাস নেই। তার কি পরিণতি শরৎচন্দ্র আঁকলেন? পাগলিনী হয়ে উপেন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় আঁচলে বাঁধা প্রসাদ উপেন্দ্রকে খাওয়াবার জন্য মিনতি করছে সাবিত্রীকে। উন্মাদ হওয়ার মত অপরাধ সত্যই কি এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী রমণী করেছিল? কমল স্বামীর গতানুগতিক ধারণা মানে না—দাম্পত্য-প্রেমের একনিষ্ঠতা তার কাছে দুর্বলতা—সকল প্রথা ও বিশ্বাসের বিদ্রোহ করাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মত, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতাই তার একমাত্র আদর্শ। অথচ আপন জীবন-আচরণে অসাধারণ

সংযম ও ত্যাগের অধিকারিণী সে। বিশ্বাস ও আচরণের এই দ্বৈধতা কেন? বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রে প্রথাবদ্ধ মনোভাব থেকে প্রগতিশীলতায় উত্তরণের কোন প্রমাণ নেই। যত বিদ্রোহী, বিচিত্র নরনারী তাঁর দ্বিতীয় পর্বের রচনায় তিনি এনেছেন, তারা সকলেই শরৎ-মানসের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দায় বহন করে অপূর্ণ, সম্ভাবনারিক্ত। প্রশ্নহীনা পতিব্রতা নারী আর বিদ্রোহিনী—কার প্রতি শরৎচন্দ্রের পক্ষপাত—এ-প্রশ্ন অবান্তর। কারণ তাঁর বিদ্রোহিণীরা চিরকাল কেউ বিদ্রোহ করেনি, সকলেই আগে পরে সমাজের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে বিদ্রোহের আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের প্রগতিশীলতার প্রশ্ন উত্থাপনে এটাকেও অবিমিশ্র অগ্রসর মনোভাব বলে মেনে নেওয়া যেতো—যদিনা তিনিই আবার রক্ষণশীল সমাধানে এগিয়ে না আসতেন। 'শ্রীকান্তে'র ৪র্থ পর্বের কমললতা চরিত্রটির কথা ধরা যাক। মূল ধারায় অপ্রয়োজনীয় এই চরিত্রটির অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাসের কাছে শ্রীকান্তের আত্ম-সমর্পণ ঘটিয়ে লেখক প্রগতি-পরিপন্থী চেতনাকেই কি মূল্য দেননি? তাঁর শেষ জীবনের উপন্যাস 'বিপ্রদাস'-এ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা বোম্বাই-বাসিনী বন্দনার মুখুজ্যে বাড়ীর ঐতিহ্যের সাথে মিশে যাওয়ার প্রবল আগ্রহ শরৎ-মানসের কোন পরিচয় বহন করে? 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন তিনি হিন্দু-সমাজের অনুশাসনে ব্যর্থ নর-নারীর হৃদয়-বেদনাটুকুই পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন, এর প্রতিকার করার তার কিছু নেই। শরৎচন্দ্রের ভাষায় এটা 'রিয়ালিষ্ট' শিল্পীর মনোভাব হয়ত, কিন্তু কিছু দায়িত্ব কি সৎ ও সংবেদনশীল শিল্পীর হাতে থাকে না? শরৎ-চন্দ্র এই দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছেন। সমাধানের ইঙ্গিত ব্যতীত সমস্যার উপস্থাপন শিল্প ক্ষেত্রে অক্ষমতা ও অপূর্ণতা। শরৎ-সাহিত্যের এই দুর্বলতা ও অপূর্ণতা বিস্ময়কর এই জন্য যে, তাঁর মানবিকতা ও সংবেদনশীলতার পরেও তিনি আপোষকামী, পলায়নপর। তিনি সমাজ-ব্যবস্থাকে সমালোচনা করেছেন, ব্যর্থ ও ব্যথিতদের জন্য অশ্রুপাত করেছেন—অথচ এই স্থিতিশীল সমাজকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে চাননি। মধ্যবিত্তের দোলাচল-চিত্ততা, পশ্চাতমুখীনতা ও দ্বৈধতা শরৎচন্দ্রকে টেনেছে, স্ববিরোধিতা তাঁর চিরকালের।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্রের অভিমতের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব প্রকট। ১৯১৬ সালে বর্মা থেকে দেশে ফেরার পর সাহিত্য রচনার সূত্রে দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জনের সাথে শরৎচন্দ্রের সৌহার্দ্যের সৃষ্টি হয়, পরে রাজনৈতিক অঙ্গনে সে-সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র সক্রিয় ছিলেন ১০/১১ বৎসর, ১৯২১-১৯৩২ পর্যন্ত। দেশবন্ধুর আহ্বানে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন ও সুভাষচন্দ্রের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নিজেকে তিনি "সুভাষী দলের লোক"[১০] বলে রাজনৈতিক পরিচয় দিতেন। কংগ্রেসে যোগদানের আগে থেকেই বাংলার বিপ্লবী দলগুলির সাথে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯২১ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনেও শরৎচন্দ্র যোগ দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের স্বভাবের সাথে মিল রেখেই রাজনীতিতেও তাঁর দূরদর্শিতা ও নিষ্ঠার পরিচয় মিলে না। কংগ্রেসে যোগদানের পর শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে অসহযোগ আন্দোলন ও চরকা-খদ্দরের প্রচারের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু নীতিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করলে উভয়ের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। শরৎচন্দ্র প্রথমে নিষ্ঠাবান কংগ্রেসী হিসাবে নিয়মিত চরকা কাটতেন ও খদ্দর পরতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে খদ্দরের মোহ তাঁর কেটে যায়। তিনি গান্ধীজিকে বলেছিলেন" "attainment of swaraj can only be helped by soldiers, not by spiders."[১১] আরও বলেছেন, তিনি চরকায় বিশ্বাস করেন না অনেকদিন চরকা কেটেছেন বলেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ চরকায় সর্মথন দেননি বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের উপর বিরূপ হয়েছিলেন। চিন্তাধারার অস্থিরতার আরো একটি উদাহরণ আছে। অসহযোগ আন্দোলনের নামে পশ্চিমী শিক্ষা বর্জন রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না, এই বর্জন জাতির জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে এই ছিল তার বিশ্বাস। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাকে আন্তরিক ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধ রচনার প্রধান কারণ সাময়িক আবেগ, স্থির চিন্তা নয়। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতভেদের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তা মূলতঃ রাজনৈতিক চিন্তাকে কেন্দ্র করেই। উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বড় ফাঁক ছিল। তিনি কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, এ-পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু কি করে তিনি নিজেকে 'সুভাষী দলের লোক' অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র

আন্দোলনে বিশ্বাসী বলছেন, আবার গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকেও সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছেন? এটা কি স্ববিরোধিতা নয়? রাজনীতিতে চাঞ্চল্য অস্থিরতা দুই-ই আছে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের কাছে এটা প্রত্যাশিত নয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখি দেশের রাজনীতি ও দেশের কল্যাণের একটা স্থির আদর্শ ছিল, সাময়িক ঘটনা ও ভাবাবেগ সেই আদর্শ থেকে তাঁকে বিচলিত করেনি কখনো। এমন বলা হচ্ছেনা, রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই অভ্রান্ত ছিলেন, কিন্তু সততার সাথে তিনি তাঁর আদর্শকে বহন করেছিলেন। এই আত্মস্থতা শরৎচন্দ্রে কোন কালে নেই, না রাজনীতি, না দেশের কল্যাণমূলক প্রগতিশীল চিন্তায়। রাজনীতির বাইরে, দেশবন্ধুর অনুপ্রেরণায় দেশ ও দেশের সমস্যাকে বুঝতে চেয়েছেন তিনি। দেশ ও গ্রামের প্রতি লোকের উদাসীনতায় শরৎচন্দ্র ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও সক্রিয় কোন সামাজিক আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেননি, বা গ্রামের সাধারণ লোকের উন্নতির জন্য কৃষি উৎপাদনগত বা অর্থনৈতিক কোন পরিকল্পনা তাঁর ছিলনা। একথা উঠছে এজন্য যে, শরৎচন্দ্র দশ-এগার বৎসর সক্রিয় রাজনীতি করেছেন। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে গ্রামের মুক্তি দেখেছেন রমেশ বা পরিবর্তিত জীবানন্দের মধ্যে। উদার-চিত্ত ভূস্বামীদের গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়েই গ্রামের মুক্তি আসবে এ-রকম একটা পরোক্ষ ধারণা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পাওয়া যায়। নিরীহ লোকেরা যে খেতে পাচ্ছেনা তার কারণ শ্রেণীগত কাঠামো নয়, জমিদার উৎপীড়ক বলেই, এবং তাদের শুভবুদ্ধির উদয়ের জন্যই তিনি অপেক্ষা করেছেন। ভারতীয় সামাজিক আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার কিছু দায় শরৎচন্দ্রও বহন করেছেন। প্রথমতঃ মানবিকতার প্রতিবন্ধকতার জন্য তিনি দায়ী করেছেন জাতিভেদ বা বর্ণ-প্রথাকে, অনুন্নত সমাজের উন্নতির বাধা জাতিভেদ নয়, শ্রেণীকাঠামো এটা শরৎচন্দ্র বুঝতে চাননি। তা ছাড়া জাতিভেদ বা বর্ণ-প্রথাকেই তিনি উৎপাটন করলেন কোথায়? নতুন সমাজ-ব্যবস্থার বদলে ট্র্যাডিশনাল সমাজেই নতুন শুভবুদ্ধি তিনি আনতে চেয়েছেন, সমাজ নয় শুধু মানুষগুলিই পালটাবে—এ-রকম ধারণা প্রগতিশীল নয়। সুতরাং ঐতিহ্যবাহী চিন্তাকে শরৎচন্দ্র দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত করে ঐতিহ্যবাদী বুদ্ধিজীবীর দ্বন্দ্বকেই প্রকট করে তুলেছেন।

আসল কথা শরৎ-মানসের মূল্যবোধগত স্থিরতা কোন ক্ষেত্রেই ছিলনা, রাজনীতির ক্ষেত্রেও না। তাঁর সাহিত্যে আমরা ('পথের দাবী' বাদ দিলে) সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত দেখি। এটা কি বিস্ময়কর নয় যে তিনি সক্রিয় রাজনীতি করেছেন প্রায় এক যুগের মত, এবং প্রথম সারিতেই ছিলেন দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে,—অথচ একটি উপন্যাসেও তিনি দেশব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক আন্দোলন—সামগ্রিক ভাবে জাতীয় চেতনাকে তুলে ধরেননি? 'পথের দাবী' (১৯২৬) ও 'তরুণের বিদ্রোহ' (১৯২৯) বাদ দিলে একমাত্র 'বিপ্রদাস' (১৯৩৪) উপন্যাসে দ্বিজদাসের অপরিণত দেশপ্রেম তিনি উল্লেখ করেছেন। 'পথের দাবী' শরৎচন্দ্রের একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস। কিন্তু এই উপন্যাসে বৃহৎ ভারতবর্ষের যথার্থ রাজনৈতিক চিন্তাধারা, স্বাধীনতা অর্জনের কর্ম-পন্থা, দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলনকে তুলে ধরা হয়নি। সব্যসাচীকেও ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির অগ্রদূত বলে কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। দেশ ও মানুষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ বর্জন করে সুদূর রেঙ্গুন শহরে ভারতের মুক্তির পরিকল্পনা করা, প্রত্যক্ষ গণ-আন্দোলন অবজ্ঞা করে শুধু গুপ্ত রাজনৈতিক কার্য-কলাপের দ্বারা ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশের স্বাধীনতা আসেনা। সব্যসাচীর ব্যক্তিগত জীবনে সাহস, ত্যাগ, উদারতার মন্ত্র যতই রোমহর্ষক বিবরণ দেওয়া হোক না কেন, সবই বাস্তব স্পর্শহীন, সুদূর ও অলীক। 'পথের দাবী'র পনের বৎসর আগে 'গোরা' রচিত হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে বৃহৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার আভাস আছে, আছে একই সাথে দেশের বেদনা ও প্রত্যাশা। গোরায় যে সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া আছে, তা নীতিগত ভাবে মানা হোক বা না হোক,লেখকের বোধে ও আন্তরিকতায় তা উজ্জ্বল। সব্যসাচীর মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র বলছেন বিপ্লব মানেই রক্তপাত নয়, বিপ্লব মানে একটা আমূল পরিবর্তন। পরিবর্তনটা দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। সেই দেশের মানুষের সাথে সব্যসাচীর কতটুকু পরিচয়? 'পথের দাবী'তে শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, সমস্ত ইংরেজ উপনিবেশগুলির মধ্যে ক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, এবং সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, শোষণ, লুণ্ঠন এই সম্পর্কেও বক্তব্য রয়েছে সত্য, কিন্তু এজন্য ইংরেজের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা পোষণ করা ছাড়া সমস্ত উপন্যাসে সব্যসাচীর আর কোন কার্য-কলাপ

দেখা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা লাভ একটি বিরাট ব্যাপার, অন্তরাল থেকে কলকাঠি নাড়লে বা গুটি কয়েক গুপ্ত হত্যা করলেই তা সম্ভব হবে না, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত থেকে শরৎচন্দ্রের একথা বোঝা উচিত ছিল। ব্যক্তি বিশেষের বীরত্বের চেয়ে জোটবদ্ধ উচচারণ অনেক বেশী শক্তি ধরে—এই সত্য রোমান্টিক অপরিণামদর্শী প্রেরণায় শরৎচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন। সে-কারণে সব্যসাচী যতই ব্যক্তিপূজা লাভ করুক, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার আদর্শ ব্যর্থ হতে বাধ্য। 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধ-গ্রন্থে দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে তিনি রাজনীতির জন্য অপরিহার্য মনে করেছেন। শুধু রাজনীতি নয়, দেশের সর্ববিধ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের যোগ দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার সবটাই ভুল একথা প্রমাণ এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যে স্ববিরোধিতার কথা বলা হয়েছে বারবার, রাজনীতির ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্রের মধ্যে তা বর্তমান ছিল—সেজন্যই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য যথার্থ রাজনৈতিক বোধে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। সমাজবোধে যেমন, রাজনীতিতেও শরৎচন্দ্র রোমান্টিক প্রেরণায় বাস্তব থেকে স্খলিত হয়েছেন, এবং অসঙ্গত, স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র শরৎচন্দ্রই। তাঁর বিদ্রোহ ভঙ্গীসর্বস্ব, আসলে তিনি একজন রক্ষণশীল মানুষ। মানবমুক্তি তাঁর কাম্য, কিন্তু সেটা ব্যক্তির শুভবুদ্ধির পথে। তিনি সংবেদনশীল শিল্পী, তাঁর পরিচিত জগতে, পারিবারিক ছোট পরিধির মধ্যে জীবনের সহজ আনন্দ-বেদনার এক অসাধারণ রূপকার তিনি। এই পরিচয়েই বাংলা সাহিত্যে তাঁর চিরকালের প্রতিষ্ঠা।

তথ্যনির্দেশ

১ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ. ১৮-১৯
২ ঐ; পৃ. ২০
৩ হুমায়ুন কবির, Sarat Chandra Chattarjee, পৃ. ১৮
৪ লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের অংশ। দ্রষ্টব্য : নারায়ণ চৌধুরী : কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র।

৫ দিলীপকুমার রায়কে লেখা পত্র, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (৪র্থ খণ্ড)
৬ হুমায়ুন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১-৪২
৭ লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের অংশ
৮ ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে অভিভাষণ
৯ ঐ
১০ রবীন্দুশেখর বসু, 'শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র', শারদীয় দেশ, ১৩৮৭
১১ ঐ